# স্মৃতির সরণী বেয়ে : মানস চক্রবর্তী

ভবানীশঙ্কর দাশগুপ্ত

বাংলা ভাষায় যে সকল শিল্পী খেয়াল ও ঠুংরি রচনা করেছেন ও পরিবেশন করেছেন, তাঁদের মধ্যে তিনজনের নাম সঙ্গীতের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাঁরা হলেন—আচার্য জ্ঞানেন্দ্র প্রসাদ গোস্বামী, আচার্য ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় এবং আচার্য তারাপদ চক্রবর্তী। এঁরা সকলেই আমার ঠাকুরদা শ্রী প্রফুল্লমোহন দাশগুপ্তের সমসাময়িক ও অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। জ্ঞানেন্দ্র প্রসাদ গোস্বামী ও তারাপদ চক্রবর্তীকে চোখে দেখার সৌভাগ্য আমার হয়নি, তবে ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়কে শেষ জীবনে দেখেছিলাম, যখন তিনি বয়সজনিত দুর্বলতায় ও মানসিক ভারসাম্যহীনতায় ভুগছিলেন। তবে তারাপদ বাবুর সুযোগ্য পুত্র, প্রখ্যাত কণ্ঠশিল্পী পণ্ডিত মানস চক্রবর্তী-র সঙ্গে আমাদের পরিবারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তিনি বাবাকে ‘দাদা’ বলে ডাকতেন, ঠাকুমাকে ডাকতেন ‘মা’ বলে, এবং প্রকৃত অর্থেই সেই সম্বোধনগুলিকে মর্যাদা দিতেন। ব্যক্তিত্ব, ভদ্রতা, ও সঙ্গীতানুশীলনের দিক থেকে তিনি ছিলেন এক অনন্য সাধক ও আদর্শবান মানুষ।

বাংলা ভাষায় শাস্ত্রীয় সংগীতচর্চার ইতিহাসে খেয়াল ও ঠুংরি রচনাকারী এবং পরিবেশক হিসেবে কিছু শিল্পীর নাম সর্বদাই আলোচিত হয়েছে। আচার্য জ্ঞানেন্দ্র প্রসাদ গোস্বামী, আচার্য ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় এবং আচার্য তারাপদ চক্রবর্তী—এই তিনজন বাংলার সংগীত ইতিহাসে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এঁরা প্রত্যেকেই বাংলা ভাষাকে শাস্ত্রীয় সংগীতের এক স্বতন্ত্র মাধ্যম হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস নিয়েছিলেন। এই ধারা পরবর্তী কালে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ হয় আচার্য তারাপদ চক্রবর্তীর পুত্র, পণ্ডিত মানস চক্রবর্তীর হাতে।

মানস চক্রবর্তী ছিলেন একাধারে খেয়াল, ঠুংরি ও অন্যান্য রাগসংগীতের পরিবেশক, রচয়িতা এবং বাংলা ভাষাভিত্তিক খেয়াল ও ঠুংরীর অন্যতম ধারক ও বাহক। তাঁর সংগীতচর্চা কেবল উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত নয়, বরং ব্যক্তিগত সাধনা, আন্তরিকতা এবং নান্দনিক দৃষ্টিভঙ্গির ফল।

## প্রথম সাক্ষাৎ ও সঙ্গীত-অভিজ্ঞতা

১৯৭৮ সালে বালিগঞ্জ শিক্ষাসদন স্কুলে মানস কাকুর অনুষ্ঠান প্রথমবার শুনি। বর্ষাকালে তিনি ধরেছিলেন রাগ মেঘ। বিলম্বিত খেয়ালের মুখড়া—"বরখা ঋতু আয়ি"—ওনার কণ্ঠে যেন নতুন প্রাণ পেয়ে উঠেছিল। তান ও আলঙ্কারিক কারুকার্য শ্রোতাদের মুগ্ধ করেছিল। এর পর তিনি পরিবেশন করেছিলেন তাঁর পিতৃদেব আচার্য তারাপদ চক্রবর্তীর রচিত একটি বাংলা ঠুংরি—"ভালো বেসে কি হল জানি না।" বাংলা খেয়াল বা ঠুংরি নিয়ে কিছু মানুষের অবজ্ঞা থাকলেও, মানস কাকুর কণ্ঠে তা একেবারে ভিন্ন মাত্রা লাভ করত। সেই আসরে অনেক সংশয়ী মানুষও বিস্মিত হয়েছিলেন তাঁর পরিবেশনা শুনে।

আচার্য তারাপদ চক্রবর্তীর পুত্র হিসেবে মানস চক্রবর্তী এক সঙ্গীতময় পরিবেশে বেড়ে ওঠেন। পিতার কাছ থেকে পাওয়া শাস্ত্রীয় সংগীতের শিক্ষাই তাঁর মূল ভিত্তি। একই সঙ্গে তিনি পারিবারিক ঐতিহ্যকে এগিয়ে নিয়ে যান। মানস চক্রবর্তী পরিবারমুখী, স্নেহশীল ও ভদ্রব্যবহারী মানুষ হিসেবে পরিচিত ছিলেন। সংগীতের বাইরে তাঁর আন্তরিকতা ও মানবিক আচরণ সমকালীন সংগীত সমাজে তাঁকে এক বিশেষ মর্যাদা এনে দেয়।

### শিক্ষাকেন্দ্র ও অরিত্র মিউজিক সার্কল

আমার বাবা, পণ্ডিত বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, তখন কয়েকজন গুরুভাইয়ের সঙ্গে মিলে আমীর খাঁ স্কুল অফ ইন্সট্রুমেন্টাল মিউজিক প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মানস কাকু এর সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হন এবং আমাদের বাড়িতে অনুষ্ঠিত আলোচনাসভাগুলিতে নিয়মিত উপস্থিত থাকতেন। পরবর্তীকালে বিশপ লেফ্রয় রোডে প্রসুন ব্যানার্জির বাড়িতে মাসিক অনুষ্ঠান হতে থাকে, যা থেকেই জন্ম নেয় অরিত্র মিউজিক সার্কল। এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে (সম্ভবত ১৯৮০ সালে) মানস কাকু পরিবেশন করেন রাগ পুরিয়া। আমি দিল্লি, বম্বে, লক্ষ্ণৌ ও বেনারসের অনেক শিল্পীর কণ্ঠে এই রাগ শুনেছি, কিন্তু মানস কাকুর পরিবেশনা যে হৃদয়ে অনির্বচনীয় আবেগ সৃষ্টি করেছিল, তা আর কারও গলায় পাইনি। সেদিনই তিনি গেয়েছিলেন আচার্য তারাপদ চক্রবর্তীর রচিত বিখ্যাত বাংলা খেয়াল "খোলো খোলো মন্দির দ্বার পূজারিণী", যা তাঁর তান ও বিস্তারের নিখুঁত প্রকাশ ঘটায়।

মানস চক্রবর্তীর কণ্ঠে রাগ পরিবেশনা ছিল রীতিনিষ্ঠ অথচ নবীনতার সঞ্চারক। ১৯৭৮ সালে বালিগঞ্জ শিক্ষাসদন স্কুলে তাঁর পরিবেশিত রাগ মেঘ শ্রোতৃসমাজকে মুগ্ধ করেছিল। বিলম্বিত খেয়ালের মুখড়া "বরখা ঋতু আয়ি" এবং পরবর্তী তান ও বিস্তার রাগটির গাম্ভীর্যকে সমুজ্জ্বল করে তোলে। পরবর্তীতে তিনি রাগ পুরিয়া, কৌশিক কানাড়া, বসন্ত-মুখারী ইত্যাদি রাগ এমনভাবে পরিবেশন করেন, যা শ্রোতাদের কাছে নতুন অভিজ্ঞতা হয়ে দাঁড়ায়। বিশেষত, পুরিয়া রাগে তাঁর পরিবেশনা ছিল হৃদয়গ্রাহী এবং স্মরণীয়।

বাংলা খেয়াল ও ঠুংরী

মানস চক্রবর্তীর বিশেষ অবদান হলো বাংলা ভাষায় খেয়াল ও ঠুংরি পরিবেশনা। আচার্য তারাপদ চক্রবর্তীর সৃষ্ট "খোলো খোলো মন্দির দ্বার পূজারিণী" বা "ভালো বেসে কি হল জানি না"—এসব গানের পরিবেশনা তিনি এমনভাবে করেছেন যে তা হিন্দুস্থানি খেয়ালের কঠোর কাঠামোতেও সমান মর্যাদার দাবি রাখে।
তাঁর নিজস্ব সৃষ্ট বাংলা ঠুংরি "বড় ব্যথা লাগে, ও খেলা খেলো না তুমি আর"—তান ও সুরকারুকার্যের দিক থেকে বেনারস বা লক্ষ্ণৌ ঘরানার ঠুংরীর সমতুল্য। এর মাধ্যমে তিনি প্রমাণ করেছেন, বাংলা ভাষায় রচিত ঠুংরী বা খেয়াল কোনো অংশে হিন্দি বা উর্দু রচনার চেয়ে কম নয়।

নতুন রাগের প্রবর্তন

মানস চক্রবর্তী কেবল প্রচলিত রাগ পরিবেশক ছিলেন না, তিনি নতুন রাগ পরিবেশন ও প্রবর্তনেও দক্ষ ছিলেন। তাঁর পিতার সৃষ্ট অহল্যা রাগের পরিবেশনা তাঁকে এক বিশেষ মর্যাদা দেয়। একইভাবে বসন্ত-মুখারী বা শ্যাম কল্যাণ-এ তাঁর স্বরবিন্যাস ও সুরসৃজন তাঁকে এক অভিনব শিল্পী হিসেবে চিহ্নিত করে।

সঙ্গীত-সভা ও বিশেষ পরিবেশনা

ডোভার লেন মিউজিক কনফারেন্সে (তখন হত বিবেকানন্দ পার্কে) মানস কাকুর কণ্ঠে রাগ কৌশিক কানাড়া শুনেছিলাম। মধ্যরাতে তাঁর গুরুগম্ভীর কণ্ঠে রাগটির এক নতুন রূপ উন্মোচিত হয়েছিল। তিনি সেদিন একটি হিন্দুস্থানি ঠুংরীও পরিবেশন করেছিলেন, যা তাঁর

বহুমুখী প্রতিভার নিদর্শন।

**১৯৯৮** সালে যোধপুর পার্কের সূর্যসেন মঞ্চে ছাত্র-ছাত্রীরা তাঁর জন্মদিন উপলক্ষে একটি অনুষ্ঠান আয়োজন করে। ভোরে তিনি গেয়েছিলেন রাগ বসন্ত-মুখারী। যন্ত্রসঙ্গীতে একাধিকবার রাগটি শোনার অভিজ্ঞতা ছিল, কিন্তু কণ্ঠসঙ্গীতে ওনার পরিবেশনা ছিল একেবারেই অনন্য। একইভাবে যোধপুর পার্কেই মাতুল কল্যাণ কুমার সেনের প্রতিষ্ঠিত সুচ্ছন্দম সংস্থার অনুষ্ঠানে তাঁকে শুনেছিলাম রাগ অহল্যা পরিবেশন করতে, যা তাঁর পিতৃদেবেরই সৃষ্টি।

আন্তরিকতা ও পারিবারিক বন্ধন

মানস কাকুর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক শুধু সংগীতেই সীমাবদ্ধ ছিল না, ছিল আন্তরিক পারিবারিক বন্ধন। একদিন হঠাৎ রাতে গাড়ি থেকে নেমে এসে তিনি বাবাকে বলেছিলেন— "আগামী মাসে আমার মেয়ের বিয়ে, আপনি সপরিবারে অবশ্যই আসবেন।" তাঁর সেই আন্তরিকতা আজও মনে পড়ে।

প্রয়াণ ও বিস্মৃতির আড়াল

দুঃখজনক হলেও সত্যি, মাত্র ৭২ বছর বয়সে বাইপাস সার্জারির পর তিনি প্রয়াত হন। সেই দিনেই আর এক বিশ্বখ্যাত সঙ্গীতশিল্পীর মৃত্যু হওয়ায় কলকাতার সঙ্গীতমহলে মানস কাকুর প্রয়াণ যেন আড়ালে চলে যায়। অথচ বাংলা খেয়াল ও ঠুংরীর প্রচলন ও মর্যাদা রক্ষায় তাঁর অবদান অপরিসীম।

উত্তরাধিকার ও শিষ্যবৃন্দ

মানস কাকুর শিষ্যদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম—খ্যাতনামা ক্রীড়াবিদ সুকুমার সমাজপতি, তাঁর পুত্র সন্দীপন সমাজপতি, শুভাশিস মুখোপাধ্যায়, গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়, রুচিরা পাণ্ডা প্রমুখ। তাঁদের মধ্য দিয়ে মানস কাকুর সঙ্গীতধারা আজও বেঁচে আছে। তাঁর ভাগ্নে শ্রীজাত বন্দ্যোপাধ্যায় আজকের প্রথিতযশা কবি ও লেখক। মানস কাকুর একটি বাংলা রচনা, শ্যাম কল্যাণ রাগে, তাঁর এক ছাত্রী পরিবেশন করেছিলেন—যেখানে সুর ও কথার অপূর্ব মেলবন্ধন ছিল।

মানস চক্রবর্তী ছিলেন শুধু আচার্য তারাপদ চক্রবর্তীর সুযোগ্য পুত্রই নন, ছিলেন বাংলা খেয়াল ও ঠুংরীর এক অনন্য সাধক, যিনি ভাষা ও সঙ্গীতকে এক সূত্রে গেঁথে নতুন মর্যাদা

দিয়েছিলেন। তাঁর গানের মধ্যে শ্রোতারা যেমন তন্ত্রীর মতো নিখুঁত স্বরবিন্যাস খুঁজে পেয়েছেন, তেমনি পেয়েছেন গভীর আবেগ ও আধ্যাত্মিকতার সুর।

এই শতাব্দীর পরিবর্তনকালে তিনি আমাদের ছেড়ে গেলেও তাঁর সঙ্গীতচর্চা, আন্তরিকতা ও স্নেহশীল ব্যক্তিত্ব আজও আমাদের মনে এক অনন্য স্মৃতি হয়ে আছে। আশা করি, ভবিষ্যতে তাঁর কোনো ছাত্র বা ছাত্রী আবারও সেই গান গেয়ে তুলবেন—যা আমাদের শোনাবে, "কত ইতিহাস মুছে গেলেও কিছু স্মৃতি অমর হয়ে থাকে।" পণ্ডিত মানস চক্রবর্তী বাংলা শাস্ত্রীয় সংগীতের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ নাম। আচার্য তারাপদ চক্রবর্তীর উত্তরসূরি হিসেবে তিনি কেবল পারিবারিক ঐতিহ্য রক্ষা করেননি, বরং বাংলা ভাষায় খেয়াল ও ঠুংরীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁর রাগ পরিবেশনা, বাংলা রচনার দক্ষ উপস্থাপন, নতুন রাগের প্রয়োগ, এবং শিষ্য-পরম্পরা আজও বাংলার সংগীতচর্চায় জীবন্ত।

বাংলা ভাষায় শাস্ত্রীয় সংগীতচর্চার যে ধারা ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে শুরু হয়েছিল, মানস চক্রবর্তী তার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাধক। সংগীতজীবনে আন্তরিকতা, মানবিকতা ও সৃজনশীলতার যে মেলবন্ধন তিনি রেখে গেছেন, তা বাংলা সংগীতের ইতিহাসে এক অমোঘ অধ্যায় হয়ে থাকবে।